রউফুর রহীম

নবিজীবনের বিশুদ্ধ ও বিস্তারিত গ্রন্থনা

(৩য় খণ্ড)

ড. ‘আলি মুহাম্মাদ সাল্লাবি

অনুবাদ

হাসান শুয়াইব

সম্পাদনা

আবু তাসমিয়া আহমদ রফিক

SEAN
PUBLICATION

সিয়ান পাবলিকেশন লিমিটেড

রউফুর রহীম : ৩য় খণ্ড
ড. 'আলি মুহাম্মাদ সাল্লাবি
গ্রন্থস্বত্ব © ২০২১ সিয়ান পাবলিকেশন

প্রথম বাংলা-সংস্করণ
১৪৪২ হিজরি। সেপ্টেম্বর ২০২১
ISBN: 978-984-8046-06-7

মূল্য: ৭৮০৳ মাত্র।

www.seanpublication.com
+৮৮ ০১৭৮১ ১৮৩ ৫০১

সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত। প্রকাশকের লিখিত অনুমতি ব্যতীত বইটির কোনো অংশ যেকোনো উপায়েই হোক ইলেক্ট্রনিক বা প্রিন্ট-মিডিয়ায় পুনঃপ্রকাশ সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ। স্ক্যান করে ইন্টারনেটে আপলোড করা কিংবা ফটোকপি অথবা অন্য কোনো উপায়ে প্রিন্ট করা অবৈধ এবং আইনত দণ্ডনীয়। বইটির অনুমোদিত অনলাইন-সংস্করণ কিনুন। কপিরাইটকৃত বই বেআইনিভাবে কিনে চৌর্যবৃত্তিকে উৎসাহিত করবেন না। ধন্যবাদ।

'Raufur-Rahim: Volume-3 An Authentic and Detailed account on the Life of Prophet ﷺ', the Bengali version of the book 'Seeratun-Nabawiyah' by Dr. Ali Muhammad As-Sallabi, Translated by Hasan shuaib, Edited by Abu Tasmiya Ahmed Rafique, published by Sean Publication Ltd. Bangladesh.

সিয়ান পাবলিকেশন লিমিটেড
ইসলামি টাওয়ার, ২য় তলা, বাংলাবাজার, ঢাকা।
০১৭৫ ৩৩ ৪৪ ৮১১

সূচিপত্র

সম্পাদকের কথা ১৩

১৮ আহযাব যুদ্ধের ইতিবৃত্ত

এক. যুদ্ধের সন নির্ণয় ১৯

দুই. আহযাব যুদ্ধের কারণ ২০

তিন. মুসলিমদের বহুজাতিক বাহিনী পর্যবেক্ষণ ২২

চার. অভ্যন্তরীণ নিরাপত্তায় নবিজির গুরুত্ব ২৪

কঠিনতম পরীক্ষার মুখোমুখি মুসলিম বাহিনী ২৮

অবশেষে মহান আল্লাহর সাহায্য ও কুরআনে আহযাব যুদ্ধের বর্ণনা ৩৯

কিছু পর্যালোচনা ও শিক্ষণীয় দিক ৪৯

আহযাব যুদ্ধ ও হুদাইবিয়া মধ্যবর্তী সময়ের গুরুত্বপূর্ণ ঘটনাবলি ৭৫

আল্লাহর রাসূলের সাথে যাইনাব বিনতে জাহাশের বিবাহ বন্ধন ৭৫

এক. নাম ও বংশধারা ৭৫

দুই. যাইদ ﵁-এর সাথে যাইনাবের বিয়ে ৭৬

তিন. দুজনের মাঝে বিচ্ছেদ ৭৮

চার. আল্লাহর রাসূলের সাথে যাইনাবের বিয়েতে নিহিত হিকমাহ ৭৯

মুশরিকদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ৯১

ইসলামি সীমানা থেকে আগাছা পরিষ্কারের অভিযান ১১৪

১২৫ হুদাইবিয়া সন্ধি: মহাবিজয়ের পদধ্বনি

এক. হুদাইবিয়া সন্ধির কারণ ও পটভূমি ১২৫
দুই. আল্লাহর রাসূলের উসফানে অবতরণ ১২৭
তিন. পথ পরিবর্তন ও হুদাইবিয়ায় অবতরণ ১২৯
চার. কাসওয়া বেঁকে বসেনি, ওর চরিত্রে এমন স্বভাবও নেই ১৩০
পাঁচ. আল্লাহর রাসূল ও কুরাইশের মাঝে দ্বিপাক্ষিক আলোচনা ১৩৩
ছয়. কুরাইশের কাছে আল্লাহর রাসূলের প্রতিনিধি ১৪২
সাত. বাইআতুর রিদওয়ান ১৪৬
হুদাইবিয়া সন্ধির ঘটনাপ্রবাহ ১৫০
যে শিক্ষাগুলোয় ঋদ্ধ হলো উম্মাহ ১৭৪
এক. আকীদাহ বিষয়ক বিধানাবলি ১৭৫

১৮৯ হুদাইবিয়া ও মাক্কা বিজয়ের মধ্যবর্তী সময়ের গুরুত্বপূর্ণ ঘটনাবলি

এক. খাইবার যুদ্ধের কারণ ও সময় নির্ণয় ১৮৯
দুই. খাইবারের পথে মুসলিম বাহিনী ১৯১
তিন. ভেঙে ফেল দুর্গ-প্রাসাদ ১৯৪
চার. গ্রাম্য শহীদ, কৃষ্ণ রাখাল এবং জাহান্নামের যাত্রী যে বীর ১৯৭
পাঁচ. হাবাশা থেকে জা'ফার ইবনু আবি তালিব ও সাথিদের প্রত্যাবর্তন ২০০
ছয়. গানীমাত বণ্টন ২০২
সাত. সাফিয়্যাহ ﵂-এর সাথে আল্লাহর রাসূলের বিয়ে ২০৫
আট. দুষ্কর্মী ইয়াহুদিদের সাথে কথোপকথন, একটি ভুনা বকরি ২০৯
নয়. মাক্কা থেকে হাজ্জাজ বিন আলাত সালামির সমূহ সম্পদ নিয়ে আসা ২১১
দশ. খাইবার অভিযান সংশ্লিষ্ট ফিকহি বিধিবিধান ২১৪
রাজাবাদশাদের কাছে চিঠি প্রেরণ ২১৮

উমরাতুল কাযা ২৩০
মূতায় অভিযান (৮ম হিজরি সন) ২৫৯
এক. কারণ ও ইতিহাস ২৫০
হুদাইবিয়া সন্ধির পরের কথা ২৫০
সিরিয়ার খ্রিষ্টানরাও বসে থাকেনি ২৫০
বাজে যুদ্ধের দামামা ২৫১
দুই. মুসলিম বাহিনীর মাআনে অবতরণ, তিন সেনাপতির বীরত্বগাথা ও শাহাদাতবরণ ২৫৪
তিন. খালিদ ইবনু ওয়ালিদকে সেনাপতি নির্বাচন ২৫৬
চার. আল্লাহর রাসূলের মু'জিযা ২৫৮
যা কিছু শিক্ষণীয় ২৫৯
জা'ফার পরিবারের প্রতি নবিজির সম্মান প্রদর্শন ২৬০
পাঁচ. নেতৃত্বের গভীরতা ২৬২
ছয়. সেনাপতির সম্মানে আল্লাহর রাসূল ﷺ ২৬৩
আল্লাহ এ যুদ্ধে মুসলিমদের বিজয় দানের পরের কথা ২৬৪
সাত. ঈমানের প্রতিযোগিতা, জিহাদে এর প্রভাব ২৬৬
যা-তুস সালাসিল অভিযান ২৬৭
২৭৫ ঐতিহাসিক মাক্কা বিজয়
এক. যে কারণে মাক্কা অভিযান ২৭৫
দুই. অভিযানের প্রস্তুতি ২৭৯
তিন. মাক্কা অভিযাত্রার ঘটনাপ্রবাহ ২৮৩
চূড়ান্ত মাক্কা বিজয়ে নবিজির গৃহীত পরিকল্পনা ২৯১
এক. বিশিষ্ট সাহাবিদের মাঝে গুরুত্বপূর্ণ কাজ বণ্টন ২৯১
দুই. বিজয়ী বেশে, বিনম্রচিত্তে মক্কা প্রবেশ ২৯৫
তিন. সাধারণ ক্ষমার ঘোষণা ২৯৯
চার. বনু জুযাইমায় খালিদ ইবনু ওয়ালিদ رضي الله عنه ৩০৩
পাঁচ. প্রতিমালয় ধ্বংসে অভিযান ৩০৫

৩২৯ হুনাইন ও তায়েফ যুদ্ধ

কারণ ও ধারাবাহিক ঘটনা প্রবাহ ৩২৯
এক. হুনাইন যুদ্ধের গুরুত্বপূর্ণ ঘটনাবলি ৩৩০
মানুষের সাথে আল্লাহর রাসূলের আচরণবিধি ৩৪১
হুনাইন ও তাবুক মধ্যবর্তী সময়ের গুরুত্বপূর্ণ ঘটনাবলি ৩৬৫

৩৭৫ সংকটময় যুদ্ধ

তাবুক অভিযান ৩৭৫
অভিযানের সময়, নামকরণ ও কারণ ৩৭৫
পথের ঘটনাপ্রবাহ, তাবুকে অবতরণ ৩৯১
তাবুক থেকে প্রত্যাবর্তন, মাসজিদে যিরার ও মুনাফিকদের ব্যাপারে কুরআনের বর্ণনা ৪০৯
অভিযানে অনুপস্থিত তিন সাহাবির গল্প ৪২৪
তাবুকের ঘটনা প্রবাহ থেকে যা কিছু শিক্ষণীয় ৪৪০
তাবুক অভিযান ও বিদায় হাজ্জের মধ্যবর্তী সময়ের ঘটনাপ্রবাহ ৪৪৬
বিদায় হাজ্জ, দশম হিজরি ৪৭৮
এক. যেভাবে সূচনা হলো বিদায় হাজ্জের ৪৭৯
নবিজির মৃত্যুব্যাধি, অতঃপর মহামহিম বন্ধুর সান্নিধ্যে ৪৯৬
দুই. আল্লাহর রাসূলের মরণব্যাধি ৫০২
তিন. শেষ দিনগুলোতে আল্লাহর রাসূলের বিদায়ী উপদেশ ৫০৪
চার. মুসলিমদের নিয়ে আবু বাকর সিদ্দীকের সালাত আদায় ৫০৬
পাঁচ. নববি জীবনের অন্তিম মুহূর্ত ৫০৭

৫১৭ সমাপ্তি

সম্পাদকের কথা

﷽ আমার এক বন্ধুর বাবা, যুক্তরাজ্যের বাসিন্দা। ভদ্রলোক সব সময় টুপি পরে থাকেন, দাড়িও রেখেছেন; নামাজ-কালাম পড়েন, দান-সাদাকাও করেন বেশ। দেশে এলে মাঝেসাঝেই আমার সঙ্গে নানান বিষয়াদি নিয়ে আলাপ-আলোচনা হয়। একদিন আলোচনার একপর্যায়ে তার মনের গভীরে প্রোথিত কিছু বিষয় বেরিয়ে আসে। বিষয়টি হলো, মাদীনার ইহুদি গোত্র বানু কুরাইযাকে নবি মুহাম্মাদ (সা.) কর্তৃক মৃত্যুদণ্ড প্রদান। এটা নিয়ে তার প্রবল আপত্তি! আপত্তির হাঁড়ি যখন ভাঙল, আরও অনেক কিছু বেরিয়ে এল। এই যেমন মা-বাবার চেয়েও কেন নবিজিকে বেশি ভালোবাসতে হবে; পালক ছেলের বৌকে বিয়ে ইত্যাদি!

এমন রোগে আক্রান্ত অনেক রুগীর সঙ্গে আমার এই জীবনে অনেকবার কথা হয়েছে। তাই আমার বুঝতে বাকি ছিল না এর গোড়া কোথায়, আর কোথায়ই-বা শেষ। আমি তাকে যথাসম্ভব চেষ্টা করেছি বিষয়গুলো ব্যাখ্যা করতে। তবে তিনি স্পষ্ট হয়েছেন কি না তা নিয়ে আমার শক্ত সন্দেহ রয়ে গেছে। একটু সংশয়াপন্ন অবস্থা দেখা গেলেও দৃশ্যত তিনি তার মত পরিত্যাগ করেননি। কী আশ্চর্য ব্যাপার, তাই না? দাড়ি-টুপি, সালাত-সিয়াম, দান-সাদাকা সবই আছে, অথচ ঈমানটাই নেই!

হাজ্জের সফরে ছিলাম। একদিন আসরের পর মাত্বাফে বসে একাগ্রচিত্তে তাকিয়ে আছি আল্লাহর ঘরের দিকে। পাশ থেকে এক ভদ্রলোকের সালামে সম্বিত ফিরে এল। জানলাম, তিনিও বাংলাদেশি; এটা তার দ্বিতীয় হাজ্জ। এক কথা দু কথায় আমাদের আলাপ জমে উঠল। একপর্যায়ে হাজ্জ আর বাইতুল্লাহ নিয়ে তার মনের গহীনে লুকিয়ে থাকা নানা সংশয় বাইরে বেরিয়ে পড়তে লাগল। আমি যখন কিছুটা পালটা যুক্তি দিলাম, অকপটে তিনি বলেই ফেললেনে, ‘আমি একটা ঘরকে

ঘিরে এভাবে প্রদক্ষিণ করার সাথে মূর্তিপূজার তেমন কোনো পার্থক্য খুঁজে পাই না!' শুনে কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে গেলাম! ডাবল হাজি সাহেব; কিন্তু ঈমান নেই!

৩ একটি হাদিসের এমন ভাষ্য আমরা এমনটা শুনেছি যে, একজন মানুষ জান্নাতের পথে চলতে থাকবে। চলতে চলতে তার আর জান্নাতের মাঝে সামান্য ব্যবধান থাকবে। তখন সে এমন কাজ করবে, যা তাকে জাহান্নামে নিয়ে যাবে। হাদিসে এ ধরনের বক্তব্য শুনে কারও কারও মেনে নিতে কষ্ট হয়; ভাবে, এটা কেমন কথা! কিন্তু আল্লাহর রাসূলের কথা তো আর ভুল হতে পারে না।

আমরা নিজেদেরকে ঈমানদার দাবি করতে ভালোবাসি; কিন্তু আমাদের কারও অন্তরে এমন কোনো সন্দেহ-সংশয় রয়ে গিয়েছে কি না তা বলা যায় না। কিংবা যে বিষয়গুলোকে ঈমানের জন্য পূর্বশর্ত সাব্যস্ত করা হয়েছে, সেগুলো আমরা হয়তো ঠিকমতো জানিই না। আর সে কারণে কুফরি মনের কোণে ঘাপটি মেরে আছে কি না, তাও হয়তো আমরা টের পাই না; কিন্তু যদি থেকেই থাকে, মৃত্যুর পূর্বের সেই কঠিন সময়ে তা নিশ্চিত বেরিয়ে আসবে। আল্লাহ আমাদের রক্ষা করুন!

৩ নবিজিকে মাতা-পিতা, সন্তানসন্ততি, ভাইবোন, স্বামী-স্ত্রী, বন্ধুবান্ধব, ব্যবসা-বাণিজ্য, অর্থ-সম্পদ, ঘরবাড়ি—সবকিছু থেকে, এমনকি নিজের প্রাণের চেয়েও বেশি ভালোবাসতে হবে—এটা ঈমানের শর্ত; এটা ছাড়া ঈমান যে গ্রহণযোগ্যই নয়, তা আমরা সকলেই জানি, কিন্তু কত জন সত্যিকারভাবে নবিজিকে সবার চেয়ে, সবকিছুর চেয়ে বেশি ভালোবাসতে পেরেছি, তা কেউ না জানলেও আল্লাহ ঠিকমতোই জানেন।

আল্লাহর ভালোবাসা উপলব্ধি করা আর রাসূলের ভালোবাসা উপলব্ধি করার মধ্যে কিছুটা তফাত আছে। কারণ, মানুষ যে দিকে চোখ ফেরায়, আল্লাহর কুদরত নিজ চোখে দেখতে পায়। তাই আল্লাহকে সর্বোচ্চ ভালোবাসা দেওয়ার যৌক্তিকতা সহজেই খুঁজে পায়; কিন্তু ১৪ শ বছর পূর্বে আগত একজন মানুষকে সবার চেয়ে বেশি ভালোবাসার যৌক্তিকতা এত সহজে উপলব্ধি করা যায় না।

এই যৌক্তিকতা কেবল তখনই উপলব্ধি করা যাবে, যখন আমরা জানব—আমাদের জন্য নবি মুহাম্মাদ ﷺ কী অবদান রেখেছেন, কী কষ্ট করেছেন, কী ত্যাগ তিনি স্বীকার করেছেন।

ইতিহাসের পাতা চিরে চিরে এই গ্রন্থটি সেই চিত্রই তুলে ধরবে আমাদের সামনে।

ﷺ নবিজির জীবনীগ্রন্থ আন্তরিক অধ্যয়নের মাধ্যমে তাঁর প্রতি ভালোবাসার সূত্রপাত হবে। যত বিস্তারিত জানব, ভালোবাসার অনুভূতি তত গভীরতা লাভ করবে।

এরপর সেই ভালোবাসাকে জীবনের অন্য সবকিছুর ওপরে স্থান দেওয়ার জন্য আমাদেরকেও ভালোবাসার দাবি পূরণ করতে হবে। কেবল জানার মাধ্যমে এ দাবি পূরণ হবে না। এ ভালোবাসাকে জীবনে সবকিছুর ওপর স্থান দিতে হলে আমাদেরকেও ত্যাগ স্বীকার করতে হবে। অন্যান্য ভালোবাসা যেমন ত্যাগের মধ্য দিয়ে নিখাদ ও গভীর হয়, তেমনই নবিজির ভালোবাসাকে সবকিছুর ওপরে প্রতিষ্ঠিত করতে হলেও ত্যাগের বিকল্প নেই। ত্যাগ স্বীকার করতে হবে সেই নবির আনীত দীনের জন্য, তাঁর প্রাণপ্রিয় উন্মাহর জন্য।

আমরা যখন সেই নবির আনীত দীনের ঝান্ডা সমুন্নত রাখার জন্য অবদান রাখব, দীনের জন্য জানমালের কুরবানি করব, ব্যক্তিগত-পারিবারিক, সামাজিক-রাজনৈতিক জীবনে তাঁর আনীত দীনের বাস্তবায়ন করব; যে উম্মাতের কল্যাণ সাধনে নবিজি তাঁর গোটা জীবনকে উৎসর্গ করেছেন, সেই উম্মাতের নিরাপত্তা রক্ষা ও কল্যাণ নিশ্চিতকরণে সাধ্যমতো ভূমিকা রাখব; দৈনন্দিন যাপিত জীবনে তাঁর আদর্শের চর্চা করব, তখনই তাঁর ভালোবাসা আমাদের অন্তরে স্থায়ী শেকড় গাড়বে, অন্য সকল ভালোবাসার ওপর স্থান লাভ করবে; ঠিক যেভাবে প্রতিনিয়ত আদর-যত্ন, স্নেহ-ভালোবাসা ও প্রতিপালনের মধ্য দিয়ে সন্তানের জন্য বাবা-মায়ের হৃদয়ে ভালোবাসা গভীর থেকে গভীরতর হয়।

ﷺ মহান আল্লাহ কুরআনুল কারীমে তাঁর প্রিয় রাসূলকে বেশ কিছু নামে উল্লেখ করেছেন। নবিজি তাঁর উম্মাতের প্রতি যে দরদ ও মায়া-মমতা দেখিয়েছেন, তার সবচেয়ে অধিক প্রতিফলন ঘটেছে দুটো নামের মধ্যে—'রউফ' ও 'রহীম'। এ নাম দুটি আল্লাহর আসমাউল হুসনা'র অন্তর্ভুক্ত। শুরুতে 'আলিফ লাম' যুক্ত করলে কেবল আল্লাহর শানেই ব্যবহার্য। আল্লাহ তাঁর রাসূলকে এ নামে উল্লেখ করা দ্বারা বোঝা যায়, এই উম্মাতের প্রতি মহান স্রষ্টার পর তাঁর নবির দরদ ও অবদানই সবচেয়ে বেশি। তাই আমরা তাঁর সীরাত গ্রন্থটিকে *রউফুর রহীম* নামে নামকরণ করেছি।

আল্লাহ এই বইয়ের লেখক, পাঠক ও এর সাথে সম্পৃক্ত সকলকে আল্লাহর রাসূলের জন্য সর্বোচ্চ ভালোবাসা নিবেদনের তাওফিক দিয়ে ধন্য করুন।

১১

আহযাব যুদ্ধের ইতিবৃত্ত

আহযাব যুদ্ধের ইতিবৃত্ত

এক. যুদ্ধের সন নির্ণয়

সীরাত ও যুদ্ধ বিষয়ক ঐতিহাসিকদের অধিকাংশের মতে আহযাব যুদ্ধ সংঘটিত হয়েছিল ৫ম হিজরির শাওয়াল মাসে।[১] ওয়াকিদি বলেন, ৫ম হিজরির জিলকদ মাসের ৮ম দিনে এই যুদ্ধ সংঘটিত হয়।[২] ইবনু সাআদ বলেন, আল্লাহ তাআলা তাঁর রাসূলের দুআ কবুল করে মুশরিকদের সম্মিলিত বাহিনীকে পরাজিত করেন ৫ম হিজরির জিলকদ মাসের চতুর্থ দিনে।[৩] তবে যুহরি, মালিক ইবনু আনাস, মূসা ইবনু উকবা থেকে বর্ণিত, আহযাব যুদ্ধ সংঘটিত হয়েছিল চতুর্থ হিজরি সনে।[৪]

উলামায়ে কেরামের অনেকে মনে করেন, যারা বলে চতুর্থ হিজরিতে এই যুদ্ধ সংঘটিত হয়েছিল, তারা হিজরাতের সন গণনা করে থাকেন মুহাররম মাস থেকে। রবিউল আউয়াল থেকে জিলহাজ্জ পর্যন্ত এই মাসগুলোকে তারা গণনার বাইরে রাখেন। কিন্তু জমহুর গবেষক উলামায়ে কেরাম মুহাররাম মাস থেকে হিজরাতের সন গণনাকে প্রত্যাখ্যান করেছেন।[৫]

এদিকে ইবনু হাযাম যাহিরি দৃঢ়তার সাথে বলেছেন, আহযাব যুদ্ধ চতুর্থ হিজরিতেই সংঘটিত হয়েছিল। কারণ, ইবনু ‘উমার ﷺ বলেছেন, আল্লাহর রাসূল তাকে তৃতীয় হিজরির উহুদ যুদ্ধ থেকে ফিরিয়ে দিয়েছেন। তখন তার বয়স ছিল

[১] আস-সীরাতুন নাবাবিয়্যাহ ফি দাওয়িল মাসাদিরিল আসলিয়্যাহ, পৃ. ৪৪৩

[২] মাগাযি, ২/৪৪০ সনদহীন

[৩] আত-তাবাকাত, ২/ ৬৫,৭৩ মুত্তাসিল সনদে।

[৪] আল-বিদায়া ওয়ান-নিহায়া, ৪/ ১০৫

[৫] প্রথম সুত্র পৃ. ৪৪৩

চৌদ্দ বছর। আর পনেরো বছর বয়সে তিনি আহযাব যুদ্ধে শরিক হয়েছেন। বোঝা গেল, এক বছর পর চতুর্থ হিজরিতে সংঘটিত হয়েছিল আহযাব যুদ্ধ।[৬]

কিন্তু বাইহাকি, ইবনু হাজার আসকালানি[৭] ও অন্যান্য মুহাদ্দিসগণ ইবনু 'উমারের এই কথার ব্যাখ্যায় বলেছেন, 'উহুদের দিন ইবনু 'উমার ছিলেন ১৪ বছরের শুরুতে, আর আহযাব যুদ্ধের সময় তিনি পৌঁছেছিলেন ১৫ বছরের শেষ সীমায়। মাঝখানে দুই বছর গত হয়েছে। অধিকাংশ ঐতিহাসিক এই মতটাই ব্যক্ত করেছেন।[৮] আমার কাছে জমহুরের এই মতটাই প্রাধান্যযোগ্য। ইবনুল কাইয়িম ﵀ এই মতটাকে সমর্থন করে বলেন—বিশুদ্ধ মতানুযায়ী ৫ম হিজরির শাওয়াল মাসে আহযাব যুদ্ধ সংঘটিত হয়েছিল। কেননা এ ব্যাপারে মতভেদ নেই যে, উহুদ যুদ্ধ সংঘটিত হয়েছিল তৃতীয় হিজরির শাওয়াল মাসে। এরপর মুশরিকরা পরের বছর যুদ্ধের অঙ্গীকার করে; কিন্তু দুর্ভিক্ষের কারণে সে বছর তারা অঙ্গীকার রক্ষা করতে পারেনি। ফলে আরেক বছর পর ৫ম হিজরি সনে ব্যাপক প্রস্তুতি নিয়ে তারা যুদ্ধের জন্য মাদীনার উদ্দেশে ধেয়ে আসে।[৯]

দুই. আহযাব যুদ্ধের কারণ:

বনু নাজীরের ইয়াহূদিরা মুসলিমদের বিরুদ্ধে মনে হিংসা আর ক্ষোভ নিয়েই মাদীনা থেকে বের হয়ে খাইবারে আশ্রয় নেয়। ফলে খাইবারে অন্যান্য ইয়াহূদিদের সাথে মিশে একটু স্থিতিশীল হতেই মুসলিমদের বিরুদ্ধে চক্রান্তের জাল বোনা শুরু করে দেয়। তারা একমত হয়, আরবের বিভিন্ন গোত্রকে টোপ দেখিয়ে মুসলিমদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে ক্ষেপিয়ে তুলবে। এ লক্ষ্যে তারা একটি প্রতিনিধি দল গঠন করে। গঠিত এই দলটির সদস্য ছিল সালাম ইবনু আবিল হাকিক, হুয়াই ইবনু আখতাব, কিনানা ইবনুর রাবি, হাওজা ইবনু কাইস ওয়ায়িলি ও আবু আম্মার।[১০]

ইয়াহূদি প্রতিনিধিরা তাদের চক্রান্তে ব্যাপক সফলতা পায়। মুসলিমদের কারণে মাক্কার মুশরিকরা অর্থনৈতিকভাবে কোণঠাসা হয়ে পড়েছিল। ফলে সহজেই তারা এদের সাথে একাত্মতা প্রকাশ করে। এমনইভাবে মাদীনায় লুটপাট চালাতে,

[৬] জাওয়ামিউস সিয়ার, পৃ. ১৮৫
[৭] ফাতহুল বারি, ৩/ ৩৯৬
[৮] ১ম সূত্রে উল্লেখিত গ্রন্থ, পৃ. ৪৪৪
[৯] যাদুল মাআদ, ২/ ২৮৮
[১০] ইবনু হিশামের সীরাহ, ৩/ ২৩৭

এখানকার ধনসম্পদের লোভে গাতফান গোত্রও ইয়াহূদিদের সাথে হাত মেলায়। প্রলুব্ধকরণের অংশ হিসেবে মাক্কার মুশরিকদেরকে ইয়াহূদিরা এ-ও বলেছিল, তোমাদের ধর্ম মুহাম্মাদের ধর্মের চেয়েও শ্রেষ্ঠ।[১১] এদিকে ইঙ্গিত করে আল্লাহ তাআলা বলেন—

> আপনি কি তাদেরকে দেখেননি, যাদেরকে কিতাবের কিছু অংশ দেওয়া হয়েছে, তারা তাগুত ও প্রতিমায় বিশ্বাস রাখে, আর কাফিরদের উদ্দেশে বলে, এরা মুমিনদের তুলনায় অধিক হিদায়াতের অনুসারী। আল্লাহ এদেরকে লানত করেছেন, আর আল্লাহ যাকে লানত করেন, আপনি তার কোনো সাহায্যকারী পাবেন না। (সূরা নিসা: ৫১-৫২)

এর প্রাসঙ্গিকতায় প্রফেসর ওফেনসন বলেন,

> ইয়াহূদিরা স্বপ্রণোদিত হয়েই একটা বিরাট অন্যায়ে প্রবৃত্ত হয়। মুশরিকদের সাথে আলোচনার সময় মূর্তিপূজার ধর্মকে তারা ইসলামের ওপর শ্রেষ্ঠত্ব দেয়; অথচ ইসলাম শুনিয়েছে এক আল্লাহর ইবাদাতের মহান বাণী। মুসলিমদের মনে কষ্টের জায়গাটা ছিল এখানে যে, এক আল্লাহর সার্বভৌমত্বে মুসলিম-ইয়াহূদিরা সমান বিশ্বাস লালন করে। তা হলে ওরা কীভাবে পারল পৌত্তলিক মূর্খতার ধর্মকে ইসলামের চেয়ে শ্রেষ্ঠ বলতে![১২]

নিঃসন্দেহে নিজেদের ধর্মের ব্যাপারে প্রশংসা শুনে কুরাইশরা বেজায় খুশি হয়েছে। তাদের আনীত প্রস্তাবের প্রতি আগ্রহ বৃদ্ধি পেয়েছে, প্রলুব্ধ হয়েছে মুসলিমদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে। এরপর তারা ইয়াহূদিদের সঙ্গে মাদীনা ধ্বংসের হামলায় একাত্মতার ঘোষণা দিয়ে শরিক থাকবার অঙ্গীকার করে।[১৩]

সবিশেষ ইয়াহূদিরা গাতফানের বেদুইন মিত্রগোত্রগুলোকে নিয়ে মুসলিমদের বিপরীতে পৌত্তলিক আরব্য জাতি ও ইয়াহূদি সেনাদের সমন্বয়ে একটি ঐক্যবদ্ধ সংঘ গঠন করে। এই সংঘের বুনিয়াদি নীতি ছিল,

১. এই ঐক্যবদ্ধ বাহিনীতে গাতফানের সেনা সংখ্যা থাকবে ছয় হাজার।

২. গাতফানের এই যোদ্ধাদেরকে খাইবারের এক বছরের সমস্ত খেজুর দেওয়া

[১১] আত-তারিখুস সিয়াসি ওয়াল-আসকারি, পৃ. ৩১০
[১২] তারিখুল ইয়াহূদ ফি বিলাদিল আরাব, পৃ. ১৪২
[১৩] প্রাগুক্ত, পৃ. ৩১০

হবে।[১৪]

ইয়াহূদি প্রতিনিধি দলটি মাদীনায় ফিরে আসবার সময় দশ হাজার সৈন্যের বিশাল এক বাহিনী নিয়ে ফিরতে সক্ষম হয়। কুরাইশ ও তার মিত্রবাহিনীর যোদ্ধা ছিল চার হাজার, আর গাতফান ও তাদের মিত্রদের সংখ্যা ছিল ছয় হাজার। সর্বমোট দশ হাজার সেনার এই বহুজাতিক বাহিনী মাদীনার দিকে ঝড়ের রূপে ধেয়ে আসে।

তিন. মুসলিমদের বহুজাতিক বাহিনী পর্যবেক্ষণ

শত্রু থেকে ইসলামি রাষ্ট্রের নিরাপত্তা ও সুরক্ষায় পূর্ণ সতর্ক অবস্থা অব্যাহত ছিল। এরই ধারাবাহিকতায় আহযাবের খবরাখবর, গতিবিধি ও তাদের প্রতিটি পদক্ষেপের দিকে দৃষ্টি রাখছিল ইসলামি রাষ্ট্র। খাইবারের প্রতিনিধি দলটি মাক্কার উদ্দেশে রওনা করার পর থেকে তাদের প্রতিটি পদক্ষেপে মুসলিমদের অনুসন্ধানি চোখ ছায়ার মতো লেগে থাকে। ইয়াহূদি প্রতিনিধি ও কুরাইশের মধ্যকার সম্পন্ন হওয়া গোপন চুক্তি, দ্বিতীয় পর্যায়ে চুক্তিতে চলে আসা গাতফানিদের ব্যাপার—সবকিছুই মুসলিমদের অবগতিতে ছিল। সংগৃহীত এসব তথ্যের ভিত্তিতে শত্রুদের থেকে মাদীনাকে রক্ষা করতে নবিজি প্রতিরোধ কর্মসূচি গ্রহণ করেন। এরই অংশ হিসেবে খুব দ্রুত একটি মাশওয়ারা সভার আয়োজন করেন। উপস্থিত হন জ্যেষ্ঠ মুহাজির ও আনসার সাহাবায়ে কেরাম। কুচক্রি ইয়াহূদিদের ভয়ানক পরিকল্পনা থেকে উত্তরণের জন্য মুক্ত আলোচনা হয় এ সভায়।[১৫]

এই বিশাল বাহিনী রুখে দিতে সালমান ফারসি ﵁ পরিখা খননের পরামর্শ দেন। সম্পূর্ণ নতুন এই পরিকল্পনার কথা শুনে আল্লাহর রাসূল ﷺ অনেকটা অবাক হন। ওয়াকিদি ﵀ বলেন: সালমান ﵁ বলেন—ইয়া রাসূলাল্লাহ, পারস্যে আমরা শত্রু প্রবেশের আশঙ্কা করলে নিজেদের রক্ষায় পরিখা খনন করতাম। আপনিও এমনটা করে দেখতে পারেন। সালমান ﵁-এর এই পরামর্শ উপস্থিত মুসলিমদেরকে অভিভূত করে।[১৬]

পরিখা খননের সিদ্ধান্ত গৃহীত হবার পর নবিজি ﷺ ও কয়েকজন সাহাবি স্থান নির্ধারণের জন্য চলে আসেন। সেনাবাহিনীর সহায়তা করতে সাধারণ মুসলিমদের

---

[১৪] মুহাম্মাদ বাশমিল রচিত আহযাব যুদ্ধ, পৃ. ১৪১

[১৫] প্রাগুক্ত, পৃ. ১৪৪, ১৪৫

[১৬] ওয়াকিদির মাগাযি, ২/ ৪৪৪। আত-তাবাকাতুল কুবরা, ২/ ৬

জন্য আরেকটি স্থান নির্দিষ্ট করেন। ওয়াকিদি ﷀ বলেন—নবিজি ﷺ কয়েকজন মুহাজির ও আনসার সাহাবিকে সঙ্গে করে নিজের ঘোড়া ছুটিয়ে মাদীনার বাইরে আসেন। তিনি অবতরণের জন্য জুতসই একটা জায়গা খুঁজছিলেন। শেষে একটু আশ্চর্য ধরনের স্থান বেছে নেন। সিলা পাহাড় পেছনে রেখে মাজাদ থেকে জুবাব পর্যন্ত পরিখা খননের সংকল্প করেন। পেছন দিক থেকে সাহাবিদের রক্ষায় সিলা পাহাড় থেকে তিনি সুবিধা লাভ করেন।[১৭]

পরিখা খননের মাধ্যমে প্রতিরোধ ব্যবস্থাকে মজবুত করতে এই স্থানগুলোকে নির্ধারণ করার কারণ হলো, শত্রুর সামনে মাদীনার শুধু উত্তর দিকটা উন্মুক্ত ছিল। এদিক দিয়ে সহজেই মাদীনায় প্রবেশ করে তাণ্ডব চালানো সম্ভব। অন্য দিকগুলোতে সে সুবিধা ছিল না। দক্ষিণ প্রান্তের উঁচু স্থানগুলো প্রাকৃতিকভাবে নিরাপত্তার দেওয়াল হয়ে ছিল। পূর্ব দিকে সকালের গা ঝলসানো উত্তাপ এবং পশ্চিমে হেলে পড়া সূর্যের তাপদাহ নীরবে প্রাকৃতিক ব্যূহের কাজ করছিল। দক্ষিণ-পূর্ব দিকে পেছন থেকে মুসলিমদের নিরাপত্তার দায়িত্বে ছিল বনু কুরাইযাহ। সেসময় নবিজি ও বনু কুরাইযার মাঝে একটি চুক্তি স্বাক্ষরিত ছিল, তারা মাদীনার বিরুদ্ধে কাউকে প্ররোচিত কিংবা সাহায্য কোনোটিই করবে না।[১৮]

আল্লাহর রাসূল ﷺ-এর এই পরিকল্পনা ছিল উন্নত ও কার্যকরী। বলতে হয় যুদ্ধক্ষেত্রে নতুন এক পদ্ধতি আবিষ্কার করেন তিনি। আরবরা যুদ্ধে পরিখা খননের কৌশলটির সঙ্গে মোটেও পরিচিত ছিল না। এটা ছিল তাদের কাছে অজানা অদ্ভুত কিছু। অন্য দিকে এই পরিখা খননের মধ্য দিয়ে মুসলিম ও আরব্য ইতিহাসে আল্লাহর রাসূলই প্রথম ব্যক্তি, যিনি পরিখা খননের প্রচলন ঘটান। এই পরিখা ইসলামের শত্রুদের সকল পরিকল্পনা মাটির সাথে মিশিয়ে দেয়। মুসলিমদের গুঁড়িয়ে দিতে এসে আচমকা পরিখার মুখে পড়ে তারা হতভম্ব হয়ে যায়। এই চমক বাস্তবায়নে মুসলিমরা কাজে লাগিয়েছেন সুদৃঢ় মনোবল, সুষ্ঠু পরিকল্পনা ও কাজের ক্ষিপ্রতা। লড়াই ক্ষেত্রে এই নতুন পদ্ধতি গ্রহণ বহুজাতিক বাহিনীকে দুর্বল ও তাদের শক্তির দণ্ড চূর্ণ করে দিয়েছিল।

[১৭] এটি মাদীনার একটি প্রসিদ্ধ পাহাড়। মুজামুল বুলদান, ৩/২৩৬

[১৮] আল-আবকারিয়্যাতুল আসকারিয়্যাহ ফি গাযওয়াতির রাসূল, পৃ. ৪৪২

চার. অভ্যন্তরীণ নিরাপত্তায় নবিজির গুরুত্ব

১. বহুজাতিক বাহিনী মাদীনার উদ্দেশে আসার খবর শুনে পরিখা খননের আগে আল্লাহর রাসূল ﷺ মুসলিমদের সন্তান, নারী ও শিশুদেরকে বনু হারিসার দুর্গে নিরাপদে রাখবার নির্দেশ দেন। যেন তারা শত্রুর শ্যেনদৃষ্টি থেকে আশঙ্কামুক্ত থাকে। নবিজি প্রথমে এদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করার প্রধানতম কারণ হলো, মুজাহিদরা যেন পরিবারের জন্য দুশ্চিন্তায় না পড়ে। স্ত্রী ও সন্তানদের ব্যাপারে নিশ্চিন্ত হওয়া গেলে সেনা সদস্যদের মন আর বিক্ষিপ্ত হবে না। পার্থিব চিন্তা তাদের তাড়া করবে না। দৈহিক ও চিন্তাশক্তি শুধু যুদ্ধের পেছনেই ব্যয় করবে; কিন্তু এর বিপরীত হলে সেনাবাহিনীর অবস্থা হবে টালমাটাল। মনোবল হারিয়ে ফেলবে। ঐক্যবদ্ধতার ক্ষেত্রেও বিরূপ প্রভাব ফেলবে এই অভ্যন্তরীণ অনিরাপদ ব্যবস্থাপনা।[১৯]

২. অভ্যন্তরীণ নিরাপত্তা ও স্থিতিশীলতায় আরও সহায়ক হয়েছে সাহাবিদের সাথে কাজে আল্লাহর রাসূল ﷺ-এর সশরীরে অংশগ্রহণ। পরিখা খননের কাজে তিনি নিজে সাহাবিদের সাথে শরিক হয়েছেন। ইবনু ইসহাক বলেন: আমি বারা ইবনু আযিবকে বর্ণনা করতে শুনেছি, তিনি বলেছেন—সম্মিলিত বাহিনী আসার আগে আল্লাহর রাসূলও পরিখা খনন করেছেন। আমি দেখেছি তিনি পরিখার মাটি বহন করছেন। এমনকি তাঁর পেটের চামড়ায় ধুলার আস্তরণ দেখা যাচ্ছিল। ঘন পশম ছিল নবিজির শরীরে।

ক্লান্তি ও জড়তা ভুলে অসীম সাহসিকতা নিয়ে নবিজি সাহাবিদের সাথে কাজ করেছেন। তাঁর সরব উপস্থিতি এক অদৃশ্য শক্তি সঞ্চারিত করেছে সাহাবিদের মনে। ফলে পরিখা খনন সমাপ্তিতে পৌঁছাতে সাহাবিরা নিজেদের সবটুকু চেষ্টা ব্যয় করেছেন।

৩. আল্লাহর রাসূল ﷺ সাহাবিদের সুখ-দুঃখ, আনন্দ-বেদনার সঙ্গী হতেন। সাহাবিদের আগলে রেখে নিজেই কষ্ট সহ্য করতেন। আহযাব যুদ্ধের দৃশ্যপটগুলো আমাদের দেখায়, অন্যদের মতো তিনিও ক্ষুধার কষ্ট সহ্য করছেন; বরং আরও বেশি। ক্ষুধার আতিশয্যে তিনি পেটে পাথর পর্যন্ত বাঁধতে বাধ্য হয়েছেন।[২০] সুখস্বাচ্ছন্দ্যের সময়েও তিনি সাহাবিদের পাশে থেকেছেন।

[১৯] গাযওয়াতুল আহযাব, ডা. মুহাম্মাদ আবদুল কাদির আবু ফারিস, পৃ. ৯৮
[২০] প্রাগুক্ত সূত্র, ১১৬, ১১৭

তিন দিন অব্যাহত ক্ষুধার পর যখন খাদ্যের ব্যবস্থা হয়েছে, তখন সাহাবিদের ভুলে শুধু নিজের কথা চিন্তা করেননি। সামনে জাবির ইবনু আবদিল্লাহ ﵁-এর হাদীসে আমরা ক্ষুধা নিবারণের দারুণ গল্প জানতে পারব।

৪. সাহাবিদের মনঃকষ্ট দূর করে তাদের তৃষ্ণ হৃদয়ে উচ্ছলতা নির্মাণে সচেষ্ট থেকেছেন নবিজি ﷺ। পরিখা খননের পর কঠিন পরিস্থিতি সবাইকে গ্রাস করে। আবহাওয়া ছিল ঠান্ডা, প্রবাহিত হতে থাকে প্রবল শৈত্যপ্রবাহ। জীবিকা নির্বাহের উপায় সংকীর্ণ। শত্রু আগমনের ভয় সর্বক্ষণ জেঁকে ধরে আছে সবাইকে। এমন করুণ পরিস্থিতিতেও সাহাবিরা পরিখা খনন করছেন, মাটি বহন করে ফেলছেন অন্য জায়গায়। এই নাজুক অবস্থায় অবশ্যই প্রয়োজন ছিল দৃঢ়তা ও উন্নত মনোবলের। কাজের ঘোরে নবিজি ভুলে যাননি, সাহাবিরাও অন্যদের মতো মানুষ। কাজ শেষে তাদেরও একটু প্রশান্তির প্রয়োজন আছে। আবার এমন একজনের মুখাপেক্ষী ছিলেন সবাই, যিনি হৃদয়ের মালিক; অন্তরের সমস্ত কষ্ট-যন্ত্রণা ভুলিয়ে আনন্দের ফল্গুধারা সৃষ্টি করেন। তাইতো দেখি মানবতার মহান প্রতিনিধি নবিজি ইবনু রাওয়াহার কবিতা আবৃত্তি করে মাটি বহন করে বলছিলেন:

'হে আল্লাহ, আপনি ছাড়া কে দিত আমাদের হিদায়াত/আপনি ছাড়া করতে পারতাম না সাদাকা, পড়তাম না সালাত।

কাজেই আমাদের ওপর আপনি প্রশান্তির জোয়ার ঢেলে দিন/সম্মুখ যুদ্ধের সময় দৃঢ় রাখুন আমাদের পদক্ষেপ।

তারা আমাদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহে প্রলুব্ধ হয়েছে/ তারা ফিতনার ইচ্ছা করলে আমরা প্রত্যাখ্যান করি।

বলবার সময় নবিজি বলিষ্ঠ কণ্ঠে শেষের ব্যক্তিটিকেও শুনিয়ে দিতেন।[২১]

আনাস ﵁ থেকে বর্ণিত, আল্লাহর রাসূলের সাহাবিরা পরিখা খননের সময় বলছিলেন 'আমরা আনুগত্যের শপথ নিয়েছি মুহাম্মাদের হাতে/ আমরণ প্রাণ নিবেদতি হবে আল্লাহর পথে।' অথবা তারা বলতেন 'শপথ নিয়েছি জিহাদের'। এরপর সাহাবিদের উদ্দীপনা বাড়িয়ে দিতে নবিজি বলতেন 'হে আল্লাহ, আখিরাতের কল্যাণই তো প্রকৃত

[২১] বুখারি, ৪১০৬

কল্যাণ/ অতএব, মুহাজির ও আনসার সাহাবিদের ক্ষমা করুন।'[২২]

জীবনের কঠিন ও যন্ত্রণাময় এই বাঁকটাকে নবিজির নিঃস্বার্থ আন্তরিকতা ও প্রফুল্লতায় গ্রহণ সাহাবায়ে কেরামকে অনেকটা নির্ভার করেছে। পাশাপাশি পরিকল্পিত পরিখা খননের কাজ দুশমন বাহিনী আসার আগেই দ্রুত সম্পন্নকরণেও জোরালো ভূমিকা রেখেছে।[২৩]

৫. সৈন্যদের জন্য স্থান নির্ধারণ, প্রয়োজনের সময় প্রস্থানের অনুমতি সাহাবায়ে কেরাম আল্লাহর রাসূলের সামনে চূড়ান্ত ভদ্রতা ও শিষ্টতার পরিচয় দিয়েছেন। অনিবার্য কোনো প্রয়োজনে কাজ ছেড়ে বাইরে যেতে হলে তারা আগে বিনয়ের সাথে অনুমতি প্রার্থনা করতেন। প্রয়োজন শেষে ফিরে এসে আবার আত্মনিয়োগ করতেন কাজে। উদ্দেশ্য একটাই, প্রতিদান ও কল্যাণের আকাঙ্ক্ষা। আল্লাহ তাআলা তাদের ব্যাপারে কুরআনে উল্লেখ করেন:

> মুমিন তারাই, যারা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের প্রতি ঈমান এনেছে, আর যখন তারা তাঁর সাথে সম্মিলিত কাজে অংশ নেয়, তখন অনুমতি প্রার্থনার আগে তারা কোথাও চলে যায় না। যারা আপনার কাছে অনুমতি চায়, তারাই আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের প্রতি ঈমান এনেছে। অতএব, তারা আপনার কাছে কোনো কাজে অনুমতি চাইলে তাদের মধ্যে যাকে ইচ্ছা অনুমতি দিন ও তাদের জন্য আল্লাহর কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করুন, নিশ্চয় আল্লাহ অতি ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু। [সূরা নূর: ৬২]

আয়াতের মর্ম হলো, প্রিয় মুহাম্মাদ, এমন নাজুক মুহূর্তে যারা নিজেদের অতি জরুরি কোনো প্রয়োজনেও আপনার অনুমতি না নিয়ে কোথাও যেতে চায় না, তাদের যাকে ইচ্ছা আপনি কাজ সেরে আসার অনুমতি দিন এবং তাদের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করুন।[২৪] আল্লাহর রাসূল ﷺ-কে এখানে ইচ্ছাধিকার দেওয়া হয়েছে, তিনি যদি দেখতেন অনুমতিপ্রার্থীর সামনে যৌক্তিক প্রয়োজন দেখা দিয়েছে এবং অন্যদের জন্য তা ক্ষতিকর নয়, তা হলে তিনি অনুমতি দিতেন। অথবা অবস্থা বুঝে সবার সাথে থাকতে বলতেন।[২৫]

---

[২২] বুখারি, ২৮৩৪। মুসলিম, ১৮০৫

[২৩] আল-কিয়াদাতুল আসকারিয়্যাহ ফি আহদির রাসূল, পৃ. ৪৮২

[২৪] সাবুনি রচিত সাফওয়াতুত তাফাসির, ১/ ৩৯১

[২৫] আহকামুল কুরআন, ইবনুল আরাবী, ৩/ ১৪১০

৬. পাহারার জন্য সাহাবিদেরকে বিভিন্ন দলে বিভক্তকরণ, শত্রু বাহিনীর যে কারও পরিখা অতিক্রম প্রতিরোধ করতে আল্লাহর রাসূল ﷺ সাহাবিদেরকে বিভিন্ন দলে বিভক্ত করে পাহারার ব্যবস্থা করেন। দায়িত্বপ্রাপ্ত মুসলিমরা নিষ্ঠার সাথে পালন করেন অর্পিত দায়িত্ব। পরিখা অতিক্রমে মুশরিকদের সকল চেষ্টা ব্যর্থ করে দেন। সন্দেহ নেই, সামরিক শক্তি ও নেতৃত্বের দিক থেকে পূর্ণ প্রস্তুত ছিলেন সবাই।

আগ্রাসী শত্রুদের প্রতিরোধে পরিখার কিনারে প্রহরী রাখাও অনিবার্য হয়ে পড়ে। একদিন তো সাহরির সময় থেকে নিয়ে দ্বিতীয় দিন মধ্যরাত পর্যন্ত বিশ্রামহীন টানা পাহারা দিয়ে যেতে হয়। রণাঙ্গনে ব্যস্ত থাকার কারণে এদিন মুসলিমদের চার ওয়াক্ত সালাত ছুটে যায়। পরে তারা এই সালাতগুলো কাযা আদায় করে নেন। ইকরিমা ইবনু আবি জাহল কিছু যোদ্ধা নিয়ে পরিখা অতক্রম করলেও ‘আলি ؓ তাদেরকে প্রতিহত করেন। কুরাইশের বিখ্যাত বীর আমর বিন আবদুদকে হত্যা করে তাদেরকে নিজের জাত চিনিয়ে দেন।[২৬] এখানে আনসারদের একটি বাহিনী নবিজির নির্দেশে প্রতি রাতে প্রহরায় নিযুক্ত হতেন। তাদের প্রধান ছিলেন উব্বাদ ইবনু বাশার ؓ। সাকুল্যে আল্লাহর রাসূলই ছিলেন মুসলিমদের সর্বাধিনায়ক। যুদ্ধের দিনগুলোতে সঠিক দিক-নির্দেশনায় সবাইকে সুন্দরভাবে পরিচালিত করছিলেন। নিখুঁত পরিকল্পনা করে সব সময় পর্যবেক্ষণও করছিলেন তা কার্যকর করণে। শত্রু বাহিনীকে প্রতিহত করতে তার নির্ণিত পরিকল্পনা ছিল নিম্নরূপ,

১. মাশওয়ারা সভায় সিদ্ধান্ত গৃহীত হবার পর পরিখা খননের নির্দেশ দেন। এজন্য মাদীনার উত্তর দিকটাকে নির্ধারণ করেন। কারণ, এই একটা দিকই মাদীনা প্রবেশের জন্য শত্রুদের সামনে উন্মুক্ত ছিল।

২. সাহাবিদের মাঝে পরিখা খননের কাজ ভাগ করে দেন। প্রতি চল্লিশ গজ মাটি খননের দায়িত্ব দেন ১০জন সাহাবিকে।

৩. কাজের ছিল নিখুঁত পরিকল্পনা এবং প্রত্যেককে নিয়োগ করা হয়েছে উপযুক্ত কাজে। তাই কোনো একজন নবিজির অনুমতি ছাড়া কর্মক্ষেত্র ত্যাগ করে বাইরে যেতে পারেনি।

[২৬] মুনীর গাযবান রচিত ফিকহুস সীরাহ, পৃ. ৫০৪। এটি আরও বর্ণিত আছে, আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া গ্রন্থের আহযাব যুদ্ধের অধ্যায়ে।

৪. রাত দিনের প্রতিটি মুহূর্ত প্রতি বিঘত স্থান পাহারা দেওয়ার জন্য সাহাবিদের সামনে স্থান নির্ধারণ করে দেন। আল্লাহর রাসূল নিজেও মুজাহিদ বাহিনীর কষ্ট দূর করে তাদেরকে উজ্জীবিত করতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখেন।

৫. সর্বোপরি নবিজি ﷺ জীবনের বাস্তব অভিজ্ঞতা, রাজনৈতিক দক্ষতা ও আল্লাহর সাহায্যে মোড়ানো নুবুওয়াতি ব্যক্তিত্ব দিয়ে সমস্ত কাজ নিয়ন্ত্রণ করতে পেরেছেন। একই সঙ্গে সম্মিলিত মুশরিক বাহিনী মাদীনায় পৌঁছার পর মুমিনদেরকে বড়োসড়ো বিপদের আশঙ্কা থেকে উদ্ধার করেছেন।[২৭] অধিকন্তু গোটা বাহিনীকে নিজের একক নেতৃত্বে ঐক্যবদ্ধ করতে পারা ছিল যুদ্ধ জয়ের অন্যতম কারণ।

কঠিনতম পরীক্ষার মুখোমুখি মুসলিম বাহিনী:

অভ্যন্তরীণ নিরাপত্তা রক্ষায় সব রকম সতর্কতা অবলম্বন এবং সম্মিলিত বাহিনী থেকে ইসলাম ও মাদীনাকে রক্ষায় যথার্থ প্রতিরোধ ব্যবস্থা গ্রহণ করেছিলেন মুসলিম বাহিনী। তা সত্ত্বেও আল্লাহর সুন্নাহ হলো, সর্বোচ্চ কসরতের পর তাঁর সাহায্য প্রকাশিত হয়। চূড়ান্ত প্রচেষ্টার পর নেমে আসে মদদ। যখনই আল্লাহর সাহায্য নিকটবর্তী হয়েছে, তার আগে বৃদ্ধি পেয়েছে বিপদাপদ, পরীক্ষা। এই আহযাব যুদ্ধের সময়টাতেও চূড়ান্ত পরীক্ষার সম্মুখীন হয়েছিলেন মুসলিমরা। যেমন:

এক. বনু কুরাইযার ইয়াহূদিদের চুক্তি ভঙ্গ ও মুসলিমদেরকে পেছন থেকে আক্রমণের চেষ্টা মাদীনার দক্ষিণে অবস্থিত বনু কুরাইযার ইয়াহূদিদের ব্যাপারে মুসলিমরা আশঙ্কা করছিলেন, এই জাতির লোকেরা চুক্তি ভঙ্গ করতে পারে। বাস্তবতা এমন হলে মুসলিমরা দুই বিপদের মাঝখানে পড়বে। পেছনে ধূর্ত ইয়াহূদি, আর সামনে সম্মিলিত শত্রু বাহিনী। ওদিকে বনু নাজীরের মিত্র ইয়াহূদি এগিয়ে গিয়ে বনু কুরাইযার মিত্র কাআব বিন আসাদের সাথে কথা বলে, যেন সে মুসলিমদের বিরুদ্ধে মিত্র বাহিনীর সাথে যুক্ত হয়।

ক্রমশ মুসলিমদের মাঝে আশঙ্কা তীব্রভাবে দানা বাঁধতে থাকে যে, বনু কুরাইযা তাদের সাথে মৈত্রী চুক্তি ভঙ্গ করছে! আল্লাহর রাসূলও একই আশঙ্কা করছিলেন। কারণ ইয়াহূদিরা এমন এক জাতি, যাদের কোনো অঙ্গীকার নেই, কথার কোনো বুকপিঠ নেই। তাই বিষয়টা খতিয়ে দেখতে প্রেরণ করেন যুবাইর ইবনুল আওয়াম

[২৭] আল-কিয়াদাতুল আসকারিয়্যাহ ফি আহদির রাসূল, পৃ. ১১

ﷺ-কে। তিনি বনু কুরাইযার জনপদ পর্যবেক্ষণ করে ফিরে এসে বলেন—ইয়া রাসূলাল্লাহ, আমি দেখলাম, ওরা দুর্গগুলো মেরামত করছে, মুসলিমদের দিকে আসার রাস্তাগুলো সুগম করছে আর একত্রিত করছে সামানপত্র।'[২৮]

বনু কুরাইযার চুক্তি ভঙ্গের প্রমাণ ও ইঙ্গিত প্রবল হলে আল্লাহর রাসূল ﷺ চারজন বক্তিকে ডেকে পাঠান। সাআদ ইবনু মুআজ, সাআদ ইবনু উবাদাহ, আবদুল্লাহ ইবনু রাওয়াহা ও খাওয়াত ইবনু জুবাইর। তাদেরকে বনু কুরাইযায় পাঠাবার সময় নির্দেশনা দিয়ে নবিজি বলেন—তোমরা সামনে চলতে থাকবে, দেখবে ওদের ব্যাপারে আমাদের কাছে পৌঁছা সংবাদ সত্য কিনা। আমাদের আশঙ্কা সত্য হয়ে থাকলে এমন ইঙ্গিতবাহী শব্দ ব্যবহার করবে, যা শুধু আমিই বুঝব। কাউকে এ ব্যাপারে জিজ্ঞেস করবে না। আর অঙ্গীকার রক্ষা করে থাকলে, তা লোকদের মাঝে প্রকাশ করবে।[২৯]

চারজন বের হয়ে বনু কুরাইযায় আসেন। তারা সবকিছু দেখে অঙ্গীকার ভঙ্গের ব্যাপারে নিশ্চিত হয়ে ফিরে আসেন। নবিজিকে ইঙ্গিতে বলেন—'আদল ওয়াল কারাহ।'[৩০] আল্লাহর রাসূল তাদের কথার উদ্দেশ্য বুঝে ফেলেন।[৩১]

বনু কুরাইযার গাদ্দারির ব্যাপারে নবিজি নিশ্চিত হন। সাহাবায়ে কেরাম মনোবল হারাতে পারেন, তাই তাদের অন্তর চাঙ্গা রাখতে সব রকম উপায়-উপকরণ ব্যবহার করেন। পাহারার জন্য তখনই সালামা ইবনু আসলামকে দুশো মুজাহিদের আমীর বানিয়ে ও যাইদ বিন হারিসাকে তিনশ মুজাহিদের আমীর বানিয়ে সীমান্তবর্তী এলাকায় পাঠিয়ে দেন। বনু কুরাইযাকে ভীত-সন্ত্রস্ত করতে সীমানায় নিয়োজিত সাহাবিরা উচ্চকিত আওয়াজে তাকবীর ধ্বনি তোলেন।

এসবের মাঝেই বনু কুরাইযা সম্মিলিত বাহিনীর সাথে শরিক হবার প্রস্তুতি সম্পন্ন করে। ভূমিকাস্বরূপ প্রেরণ করে খেজুর, যব ও তীনফল বোঝাই বিশটি উট। উদ্দেশ্য, তাদেরকে সাহায্য করা ও অবরোধ দীর্ঘ করণে শক্তি জোগানো; কিন্তু সকাল হতেই পাহারারত মুসলিমরা তা বাজেয়াপ্ত করে নেন। সরাসরি নিয়ে আসেন

[২৮] ওয়াকিদি রচিত মাগাযি, ২/ ৪৫৭

[২৯] ইবনু হিশাম, ৩/ ২৩২ বাইহাকি রচিত দালায়িলুন নুবুওয়াহ, ৩/ ৪২৯

[৩০] হুযাইলের দুটি শাখাগোত্র, যারা এর আগে জাতুর রাজী' স্থানে সাহাবিদের সাথে গাদ্দারি করেছিল।

[৩১] আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া, ৪/ ৯৫

নবিজির কাছে। অল্প সময়ের ব্যবধানে ইয়াহূদিদের পণ্য মুসলিমদের গানীমাতে পরিণত হয়।[৩২]

দুই. মুসলিমদের ওপর কঠোর অবরোধ, মুনাফিকদের পিছুটান ও মুশরিকদের আক্রমণ বনু কুরাইযা যুক্ত হবার পর সম্মিলিত বাহিনী মুসলিমদের ওপর অবরোধ কঠিন পর্যায়ে নিয়ে যায়। মুমিনদের কষ্টের পরিধি ব্যাপৃত হয়। অবস্থা হয়ে ওঠে আরও সঙ্গিন। মুসলিমদের ওপর আপতিত এই যন্ত্রণাময় অবস্থার বর্ণনা খুব সুন্দরভাবে দিয়েছে কুরআন। ভয় ও শঙ্কার কথা ফুটিয়ে তুলেছে অতি চমৎকারভাবে। আল্লাহ তাআলা বলেন,

> ‘যখন তারা তোমাদের নিকটবর্তী হয়েছিল উচ্চ ভূমি ও নিম্নভূমি থেকে এবং যখন তোমাদের দৃষ্টিভ্রম হচ্ছিল, প্রাণ হয়েছিল কণ্ঠাগত এবং তোমরা আল্লাহ সম্পর্কে নানা বিরূপ ধারণা পোষণ করতে শুরু করছিলে।সে সময়ে মুমিনগণ পরীক্ষিত হয়েছিল এবং ভীষণভাবে প্রকম্পিত হচ্ছিল।’ (সূরা আহযাব: ১০-১১)

তবে প্রকৃত মুমিনদের অন্তরে আল্লাহর ব্যাপারে আস্থা ছিল অবিচল। আল্লাহ তাআলা সে কথা ব্যক্ত করে বলেন—

> ‘মুমিনরা বহুজাতিক বাহিনী দেখে বলল, এটা সেই বিষয়, যার ওয়াদা আল্লাহ ও তাঁর রাসূল আমাদের সাথে করেছিলেন। এরপর তাদের কেবল ঈমান ও সমর্পণই বৃদ্ধি পেয়েছে।’(সূরা আহযাব: ২২)

কিন্তু মুনাফিকরা ভীত-কম্পিত হয়ে মুসলিম বাহিনী থেকে সরে আসে। তীব্র শঙ্কা জেঁকে বসে ওদের মনে। মাতাব বিন কুশাইর তো বলেই ফেলল ‘বনু আমরের ভাইয়েরা, আমার কথা শুনছ, মুহাম্মাদ আমাদেরকে অঙ্গীকার দিয়েছিল আমরা নাকি কিসরা-কাইসারের ধনভান্ডার লাভ করব, অথচ আমরা এখন ইসতিঞ্জায় যেতেও ভয় পাচ্ছি। অনেকে বাড়ি অরক্ষিত হয়ে পড়ার অজুহাত দেখিয়ে বাসায় যাওয়ার অনুমতি চায়। আসলে তাদের অন্তরে বাসা বেঁধেছিল কাপুরুষতা, ভীরুতা ও মুমিনদেরকে হীনম্মন্য করার নীচ চিন্তা। কিছু দুর্বল ঐতিহাসিক বর্ণনায় মুনাফিকদের কাপুরুষতার কথা আলোচিত হয়েছে;[৩৩] কিন্তু আল্লাহ তাদের কুটিল

[৩২] আস-সীরাতুল হালবিয়্যাহ, ২/ ৩২৩
[৩৩] তাবারানী রচিত মুজামুল কাবীর, ১১/ ৩৭৬